بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ জুলাই, ২০২৪ মোতাবেক ১৯ ওয়াফা, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের বিবরণ গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছিল। বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

সহীহ্ বুখারীতে এই আক্রমণের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিকের ওপর এমতাবস্থায় আক্রমণ করেন যখন তারা অপ্রস্তুত ছিল এবং তাদের গবাদি পশুগুলোকে ঝরণায় পানি পান করানো হচ্ছিল। তিনি (সা.) তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করেন এবং তাদের সন্তানদের বন্দি করেন। সে দিনই জুওয়াইরিয়া (রা.) তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এই ঘটনা বলেছেন এবং তিনিও উক্ত সেনাদলে ছিলেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ আ'তাকা, বাবু মান মালাকা মিনাল্ আরাবি রাকীকান, হাদীস নং: ২৫৪১)**

ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে উক্ত আক্রমনের বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে উভয় রেওয়ায়েতকে এমনভাবে বর্ণনা করে গেছেন যেন বুখারীর রেওয়ায়েতে বনু মুস্তালিকের আক্রমণের ঘটনার বিবরণে স্ববিরোধ আছে, কেননা বুখারীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী মুসলমানগণ অকস্মাৎ ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের (তথা বনু মুস্তালিকের ওপর) আক্রমণ করেছিল আর রেওয়ায়েতের মাঝে স্ববিরোধ বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজারের সম্মুখেও ছিল। অতএব, আল্লামা ইবনে হাজার উভয় প্রকার রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে লিখেন, এ বিষয়ের সম্ভাবনা আছে যে, ইসলামী সেনাবাহিনী যখন আচমকা ঝর্ণার কাছে তাদেরকে ঘিরে ফেলে তখন তারা কিছুটা সময় স্থির থাকে, এরপর তাদের মাঝে সারি সুবিন্যস্ত করা হয়, (এরপর) যুদ্ধও হয়, মুসলমানরা বিজয়ী হয় আর বনু মুস্তালিক পরাজিত হয়। (ফতহুল বারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৪৭, করাচির কাদীমী কিতাবখানা থেকে প্রকাশিত) অর্থাৎ প্রথমে যখন আক্রমণ করা হয় তখন তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, যেমনটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন। কিন্তু জীবনীকারদের ভাষ্য অনুযায়ী এরপর তারা সারি ইত্যাদি বিন্যস্ত করে আর উভয় পক্ষের মাঝে যুদ্ধও হয়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকেও এই (ভিন্নধর্মী) দুটি রেওয়ায়েতের মাঝে সমন্বয় করেছেন আর তা এরূপে যে, তিনি (রা.) জীবনীকারদের এবং সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন:

"এই যুদ্ধ সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীতে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু মুস্তালিকের ওপর এমন এক সময় আক্রমণ করেছিলেন যখন তারা অপ্রস্তুত অবস্থায় নিজেদের গবাদি পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই রেওয়ায়েত ঐতিহাসিকদের রেওয়ায়েতের বিরোধী নয় বরং এ উভয় রেওয়ায়েত দুটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মূল ঘটনা হলো, ইসলামী সেনাবাহিনী যখন বনু মুস্তালিকের নিকটে পৌঁছে তখন তারা যেহেতু জানতো না যে; মুসলিম (সেনাদল) একেবারেই তাদের কাছে এসে গেছে। (যদিও তারা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ সুনিশ্চিতভাবে পেয়ে

গিয়েছিল কিন্তু) তারা নিশ্চিন্তমনে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল আর এই অবস্থার প্রতিই বুখারীর রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু তারা যখন মুসলমানদের আগমনের সংবাদ অবগত হয় তখন তারা তাদের পূর্বপ্রস্তুতি অনুযায়ী (পূর্বেই তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল) ত্বরিত সারিবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর ঐতিহাসিকরা এই অবস্থারই উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার এবং অন্যান্য কতিপয় গবেষক উক্ত মতবিরোধের এমনই ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর এটিই সঠিক মনে হয়।" {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ৫৫৯}

এই যুদ্ধে হযরত হিশাম বিন সুবাবা (রা.) নামক একজন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন।

তাঁর (শাহাদতের) ঘটনায় লেখা আছে, কেবল একজন সাহাবীই শহীদ হয়েছেন আর তাও ভুলক্রমে একজন মুসলমানের হাতেই শহীদ হয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল হযরত হিশাম বিন সুবাবা (রা.)। একজন আনসারী সাহাবী অওস (রা.) তাকে মুশরিক মনে করেন এবং ভুলক্রমে শহীদ করেন। হিশাম (রা.) হযরত উবাদাহ্ বিন সামেত (রা.)-র গোত্রের সদস্য ছিলেন।

হযরত হিশাম বিন সুবাবা (রা.)-র শাহাদতের ঘটনা এভাবে ঘটেছিল যে, তিনি শত্রুর সন্ধানে বের হয়েছিলেন। তিনি যখন ফেরত আসছিলেন তখন তীব্র ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল আর চতুর্দিক ধূলিধূসরিত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় তিনি আনসারী সাহাবী হযরত অওস (রা.)-র মুখোমুখি হন। তিনি তাঁকে চিনতে পারেন নি। তিনি মনে করেন, ইনি মুশরিকদের-ই একজন, তাই তিনি হিশাম (রা.)-র ওপর আক্রমণ করে তাকে শহীদ করেন। হিশাম (রা.)-র ভাই মিকইয়াস বিন সুবাবা, যে মক্কায় অবস্থান করছিল; সে মদীনায় আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। আর তার ভাইয়ের মৃত্যু যেহেতু ভুলবশত হয়েছিল তাই সে তার ভাইয়ের রক্তপণ দাবি করে। তখন মহানবী (সা.) হিশাম (রা.)-র ভাই মিকইয়াস বিন সুবাবাকে হযরত অওস (রা.)-র কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করে দেন আর সে তা গ্রহণও করে। কিন্তু রক্তপণ গ্রহণ করার পরও মিকইয়াস তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে হযরত অউস (রা.)-কে হত্যা করে এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে কুরাইশদের সাথে গিয়ে যোগ দেয়। মনে হচ্ছে, সে পরিকল্পনা করেই এসেছিল। আরবের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, কেউ রক্তপণ গ্রহণের পর কাউকে হত্যা করবে না কিন্তু তার এই বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে মহানবী (সা.) এই অন্যায় হত্যাকাণ্ডের জন্য শাস্তি হিসাবে তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। অতএব, নুমায়লাহ্ নামক একজন সাহাবী মক্কা বিজয়ের দিন মিকইয়াসকে হত্যা করেন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ২৪৮, বৈরুতের দ্বারুল্ মা'রেফা হতে ২০০০ সালে মুদ্রিত), কিতাবুল মাগাযী লিলওয়াকদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৭-৪০৮, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে মুদ্রিত)

এই যুদ্ধের সময় ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) (যখন) আমাদের কাছে আসেন তখন আমরা মুরায়সিতে অবস্থান করছিলাম। আমি আমার পিতাকে একথা বলতে শুনেছি যে, এত বিশাল সৈন্যবাহিনী এসেছে যাদের মোকাবিলা করার শক্তি-সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আমি নিজে এত বিপুল সংখ্যক মানুষ, যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া দেখেছি যা আমি তা বর্ণনা করতে পারব না। হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি আর মহানবী (সা.) আমাকে বিয়ে করেন এবং আমরা (যখন) ফেরত আসি তখন আমি

মুসলমানদের দেখতে থাকি। তারা আমার কাছে পূর্বের মতো বিশাল সংখ্যায় দৃষ্টিগোচর হয়নি যেমনটি যুদ্ধের সময় দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। আমি (পরে) জানতে পারি যে, **এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক প্রকার প্রতাপ ছিল যা মুশরিকদের হৃদয়ে প্রথিত করা হয়**। বনু মুস্তালিকের একব্যক্তি যিনি পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলতেন, আমরা শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের দেখেছি; যারা **'আবলাক'** বা কালো ও সাদা ঘোড়ার ওপর আরোহিত ছিল। আমরা তাদেরকে পূর্বেও দেখিনি আর পরেও কখনো দেখিনি। **(সীরাত বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-১৬৫, রিয়াদের দ্বারুস্ সালাম থেকে প্রকাশিত)**

মালে গনিমত সম্পর্কে লেখা আছে, গনিমতের উটের সংখ্যা ছিল দুহাজার। ছাগলের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার এবং যুদ্ধবন্দি ছিল দুশ'টি পরিবার। **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, যুদ্ধবন্দিদের সংখ্যা সাতশ'রও বেশি ছিল। **(সীরাতুল্ হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

মহানবী (সা.) হযরত বুরায়দাহ্ বিন হুসায়েব (রা.)-কে এই বন্দিদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তাদের কাছে যে যুদ্ধাস্ত্র এবং ধনসম্পদ ছিল তা জমা নিয়ে নেওয়া হয়। পশুপালকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি (সা.) সেগুলো দেখাশোনার জন্য নিজের দাস হযরত শুকরান (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। খুমুস ও মুসলমানদের অংশ দেখাশোনার জন্য হযরত মাহমিয়া বিন জাযা (রা.)-কে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। তিনি (সা.) সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে খুমুস পৃথক করেন। {খুমুস হলো আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী মালে গনিমতের মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশ যা আল্লাহ্, তাঁর রসূল (সা.), রসূল (সা.)-এর নিকটাত্মীয় এবং ইসলামের বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য পৃথক করা হয়।} যুদ্ধবন্দিদেরকে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। এছাড়া (তাদের) ধনসম্পদ, গবাদিপশু ও ভেড়া-ছাগলগুলোও মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়। **(কিতাবুল মাগাযী ওয়াকদী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১০, বৈরুতের আলেমুল কুতুব থেকে ১৯৮৪ সালে মুদ্রিত), {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৮৮}**

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়, যেমনটি আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

"বনু মুস্তালিক গোত্রের যেসব লোক বন্দি হয়েছিল তাদের মাঝে এই গোত্রের নেতা হারেস বিন আবী যেরারের কন্যা 'বাররাহ্'ও ছিলেন, {মহানবী (সা.) যার নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন জুওয়াইরিয়া} তিনি মুসাফে' বিন সাফওয়ানের সহধর্মিনী ছিলেন (কিন্তু) সে (তথা মুসাফে' বিন সাফওয়ান) মুরায়সির যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করে। এই বন্দিদেরকে মহানবী (সা.) (ইসলামী) রীতি অনুযায়ী মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আর বণ্টনের ভিত্তিতে বার্রাহ বিনতে হারেসকে এক আনসার সাহাবী সাবেত বিন কায়েস (রা.)-র হাতে তুলে দেওয়া হয়। বাররাহ্ মুক্ত হওয়ার জন্য সাবেত বিন কায়েস (রা.)-র সাথে বিভিন্ন মুকাতেবাতের মাধ্যমে সমঝোতা করেন।"

(মুকাতেবাত বলা হয়, কোনো দাস অথবা দাসি যদি তার মালিকের সাথে এই চুক্তি করে যে, সে একটি নির্ধারিত অংক প্রদান করে মুক্ত হয়ে যাবে)। যাহোক, তিনি সমঝোতা করেন যে, তিনি যদি তাকে সেই অর্থ (যে অংক নির্ধারিত ছিল তা হলো নয় আউকিয়া স্বর্ণ যা ৩৬০ দিরহামের সমপরিমাণ) ফিদিয়া হিসেবে প্রদান করে তবে তাকে স্বাধীন করে দেওয়া হবে। এই চুক্তির পর বাররাহ্ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা

করেন আর বনু মুস্তালিকের নেতার কন্যা হওয়ার বিষয়টি বার বার উপস্থাপন করে সে ফিদিয়ার অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। তার বক্তব্য শুনে মহানবী (সা.) গভীরভাবে প্রভাবিত হন। আর সম্ভবত এটি ভেবে যে, **তিনি (জুওয়াইরিয়া) যেহেতু একটি বিখ্যাত গোত্রের নেতার কন্যা হয়ত তার মাধ্যমে সেই গোত্রে তবলীগের পথ সুগম হবে, তাই তিনি (সা.) তাকে মুক্ত করে তাকে বিয়ে করার সংকল্প করেন।** যাহোক, তিনি (সা.) স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে তাকে (বিয়ের) প্রস্তাব দেন এবং তার পক্ষ থেকে সম্মতি লাভের পর তিনি (সা.) নিজের পক্ষ থেকে তার ফিদিয়ার অর্থ পরিশোধ করে তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহাবীরা (রা.) যখন দেখেন, তাদের মনিব বনু মুস্তালিকের নেতার কন্যাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছেন তখন তারা মহানবী (সা.)-এর শ্বশুরকুলের লোকজনকে নিজেদের কাছে বন্দি রাখার বিষয়টিকে নবুয়্যতের মর্যাদার পরিপন্থি মনে করেন আর এভাবে একশ'টি পরিবার অর্থাৎ শত শত কারাবন্দিকে কোনো ফিদিয়া ছাড়াই তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেন। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন,

জুওয়াইরিয়া (রা.) তার জাতির জন্য অত্যন্ত বরকতপূর্ণ সত্তা প্রমাণিত হয়েছেন। এই আত্মীয়তা এবং এই অনুগ্রহের ফলাফল এটি হয়েছিল যে, বনু মুস্তালিকের লোকজন অতি দ্রুত ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুসারিদের অন্তর্ভুক্ত হন।" {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃ: ৫৭০-৫৭১}

একটি রেওয়ায়েত এমনও আছে যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র পিতা হযরত হারেস (রা.) তার কন্যার ফিদিয়া নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং ফিদিয়া দিয়ে হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-কে মুক্ত করার পর তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেন আর এরপর মহানবী (সা.)-এর সাথে তার (জুয়াইরিয়ার) বিয়ে হয়।

সিরাত ইবনে হিশামে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন বনু মস্তালিকের যুদ্ধ শেষে মদীনায় ফিরে আসেন তখন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র পিতা হারেস বিন আবী যিরার তার মেয়ের ফিদিয়া দেওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে আসে। তিনি যখন 'আকীক উপত্যকা'য় পৌঁছেন তখন সে তার কন্যার ফিদিয়া হিসেবে দেয়ার জন্য যে উটগুলো সাথে করে নিয়ে এসেছিল তার মধ্য থেকে দুটি উট তার খুবই পছন্দ হয়। তিনি সেগুলোকে 'আকীক উপত্যকা'র কোনো ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা)! আপনি আমার কন্যাকে আটক করেছেন; এই নিন তার ফিদিয়া। তিনি (সা.) বলেন, সেই দুটি উট কোথায় যা তুমি আকীকের অমুক অমুক ঘাঁটিতে লুকিয়ে রেখেছিলে? হারেস একথা শুনে প্রভাবিত হয় এবং বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই আর মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। তিনি বলতে থাকেন, আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্‌ই সেই সত্তা যিনি আপনাকে এ বিষয় সম্পর্কে অবগত করেছেন, কেননা তখন সেই উটগুলোর পাশে হারেস ছাড়া আর কেউই ছিল না। অতঃপর হারেস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সাথেই তার দুই পুত্র আর তার গোত্রের কিছু মানুষও ইসলাম গ্রহণ করেন। **(সীরাতুন্ নবুবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭৩-৪৭৪, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

একটি রেওয়ায়েতে এই বিবরণ পাওয়া যায় যে, হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস স্বীয় গোত্র (অর্থাৎ) বনু মুস্তালিক গোত্রের বন্দিদের ফিদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে এসেছিল কিন্তু পথিমধ্যে তিনি উটগুলো এবং ইথিওপিয়ার এক দাসীকে একটি স্থানে

লুকিয়ে রাখেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে বন্দিদের মুক্তিপণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে; কিন্তু তুমি ফিদিয়াস্বরূপ কি নিয়ে এসেছ? সে বলে, আমি তো কিছুই আনি নি। মহানবী (সা.) বলেন, সেই তাগড়া উট এবং কৃষ্ণকায় দাসী কোথায়, যাদেরকে তুমি অমুক অমুক স্থানে লুকিয়ে রেখেছ? একথা শুনেই আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। আরও বলেন, আমি যখন ফিদিয়ার সম্পদ লুকিয়েছিলাম তখন আমার সাথে অন্য কেউ ছিল না আর ঐ ঘটনার পর আমার আগে আপনার কাছে অন্য কেউ আসে নি। মোটকথা, এরপর সে মুসলমান হয়ে যায়। **(আল্ ইস্তিয়াব ফী মা'রিফাতিল্ আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকেও লিখেছেন,

"হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র বিয়ে সম্পর্কে এমনও একটি রেওয়ায়েত এসেছে যে, তার পিতা যখন তাকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যের কল্যাণে মুসলমান হয়ে যান। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব পেলে {অর্থাৎ বিয়ের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন} তিনি স্বয়ং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেন। {হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এম, এ রচিত সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তক, পৃঃ ৫৭১}

হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর আগমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখি (অর্থাৎ তিনি যখন সেখানে বনু মুস্তালিকের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন,) তিনি (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, **ইয়াসরেবের আকাশ (মদীনা) থেকে চাঁদ উদিত হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে।** আমি এ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা পছন্দ করি নি, এমনকি (এরইমধ্যে) মহানবী (সা.) চলে আসেন। আমাদেরকে যখন বন্দি করা হয় তখন আমার সেই স্বপ্ন পূর্ণ হওয়ার আশা জাগে। মহানবী (সা.) যখন আমাকে মুক্ত করেন এবং আমাকে বিয়ে করেন তখন খোদার কসম! আমি তাঁর (সা.) সাথে আমার গোত্রের ব্যাপারে আলাপ করি নি। আমি আমার গোত্রের মুক্তির জন্য কোনো সুপারিশও করি নি। এমনকি মুসলমানরা নিজেরাই তাদের মুক্ত করে দেন। (একথা) আমি জানতেও পারি নি। অবশেষে আমার এক ফুফাতো বোন আমাকে এ বিষয়ে জানালে তখন আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা করি। **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৭, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত জুওয়াইরিয়া (রা.)-র দেনমোহর নির্ধারণ করেন চারশ' দিরহাম। মোটকথা, মহানবী (সা.) এ যুদ্ধে বিজয়ী ও সফল হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সর্বমোট আঠাশ দিন মদীনার বাইরে ছিলেন। **(আস্ সীরাতুন্ নবুবিয়্যা লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৬৭৪, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

যাহোক, **মহানবী (সা.) এই যুদ্ধ থেকে বিজয় ও সফলতার সাথে মদীনায় ফিরে আসেন।** **(সুবুলুল্ হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৪, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূলের প্রকাশ্য কপটতা এবং সে যে বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, ইতিহাসে এরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এর বিশদ বিবরণ হলো, বনু মুস্তালিকের সাথে যুদ্ধ শেষ হয় আর মুসলমানরাও তখন মুরাইসির কূপের পাশে উপস্থিত ছিল। সেই কূপের পানি অনেক কম ছিল। বালতি ফেললে অর্ধেক ভরে (ওপরে) আসত। (এমন সময়) কূপের পাশে

বনু খাযরাজ গোত্রের মিত্র সিনান বিন ওয়াবার জুহানী আসে। তখন কূপের পাশে মুহাজির ও আনসারের একটি দল ছিল। সিনান বিন ওয়াবার জুহানী (পানি তোলার জন্য) নিজের বালতি ফেলেন এবং উমর বিন খাত্তাব (রা.)'র ভৃত্য জাহজা বিন মাসঊদ গিফারীও পানি তোলার জন্য নিজের বালতি ফেলেন। সিনান এবং জাহজা'র বালতি বাড়ি খায়। তখন এই দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়। (পানি অল্প ছিলো, কেউ পূর্ণরূপে পানি পায়নি।) জাহজা সিনানকে আঘাত করে এবং তার (শরীর থেকে) রক্ত প্রবাহিত হয়। তখন সিনান সাহায্যের জন্য চিৎকার করে, হে আনসার! আর জাহজাও ডাক দেয়, হে মুহাজির! আরেকটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হে কুরাইশ! তখন উভয় গোত্রের একদল লোক সেখানে উপস্থিত হয় এবং অস্ত্র বের করে। বড়ো ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ সংবাদ পান এবং তিনি (সা.) এসে বিবাদ মীমাংসা করেন। যাহোক, এর বিশদ বিবরণ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত রয়েছে।

সহীহ্ বুখারীর একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী বিবাদের যে কারণ বর্ণিত হয়েছে তা হলো, মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন আনসারের একজনের পেছনে লাথি মারে। তখন সেই আনসারী বলে উঠে, হে আনসার! সাহায্যের জন্য আসো। আর সেই মুহাজির বলে, হে মুহাজির! সাহায্যের জন্য আসো। তাদের উভয়ের মাঝে বিবাদের কারণ ছিল পানির চৌবাচ্চা, যেখান থেকে আনসারীর উট পানি পান করেছিল। মহানবী (সা.) উপস্থিত হয়ে বলেন, অজ্ঞদের মতো এই আওয়াজ কেন? তোমরা কি কথা বলছো? এগুলো অজ্ঞদের মতো কথাবার্তা। তাঁকে (সা.) পুরো ঘটনা খুলে বলা হলে তিনি (সা.) বলেন, **তোমরা এমন বিষয় উপেক্ষা করো, এগুলো ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে নষ্ট করে ফেলে। প্রত্যেকের উচিত সে যেন তার ভাইকে সাহায্য করে তা সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। যদি সে অত্যাচারী হয় তাহলে তাকে অত্যাচার থেকে বিরত করে আর যদি সে অত্যাচারিত হয় তাহলে তাকে সাহায্য করে।** মুহাজিরদের একটি দল হযরত উবাদাহ্ বিন সামিত (রা.)-র সাথে আলোচনা করে এবং আনসারের একটি দল সিনানের সাথে আলোচনা করলে সিনান নিজের অধিকার ছেড়ে দেন। মহানবী (সা.)-এর এসব কথা তাদের কাছে পৌঁছান, কথা বলেন এবং বুঝান; ফলে সিনান নিজের অধিকার ছেড়ে দেন।

আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই নিজের দশজন মুনাফিক সঙ্গীসহ (সেখানে) বসে ছিল। সেখানে হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.)ও ছিলেন, কিন্তু তিনি তখনও অল্পবয়স্ক ছিলেন। অথবা কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে তখনও প্রাপ্তবয়স্ক হন নি। যদিও কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই জাহজা'র এই ডাক শুনতে পায় যে, হে কুরাইশের লোকেরা! (এতে) সে ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়। সে বলে, খোদার কসম! আমি আজকের মতো দিন কখনো দেখি নি। (সে) বলতে থাকে, খোদার কসম! আমার তো মহানবী (সা.)-এর মদীনায় আগমনের সময় থেকেই এই ধর্ম ভীষণ অপছন্দ ছিল, কিন্তু আমার জাতি আমার ওপর প্রাধান্য লাভ করে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। কুরাইশের লোকেরা আমাদের শাসক বনে বসে আর আমাদের শহরে তাদের আধিক্য হয়ে যায় এবং (তারা) আমাদের অনুগ্রহরাজির অবমূল্যায়ন করেছে। সে খুবই নোংরা দৃষ্টান্ত দেয়, কুরাইশের লোকেরা এমন– যেমন বলা হয় যে, **'নিজের কুকুরকে মোটাতাজা করো যেন সে তোমাকে খেয়ে ফেলে'**। (সে) বলতে থাকে, আমার মনে হচ্ছিল জাহজা যেভাবে ডাক দিয়েছে (হায়) এমন ডাক শোনার পূর্বে আমি যদি মারা যেতাম। আমি এখানে উপস্থিত আছি, আমার দ্বারা

এ সবকিছু সহ্য হচ্ছে না। **'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমরা মদীনায় পৌঁছে যাই তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বের করে দিবে।'** এরপর স্বজাতির উপস্থিত লোকদের প্রতি মনোযোগী হয়ে বলে, তোমরা নিজেরাই নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ। তোমরা তাদেরকে নিজেদের শহরে থাকতে দিয়েছ আর তারা সেখানেই আস্তানা গেড়েছে। তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদে তাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করেছ, ফলে তারা সম্পদশালী হয়ে গেছে। খোদার কসম! এখনো যদি তোমরা নিজেদের হাত গুটিয়ে নাও তাহলে তারা তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য শহরে চলে যাবে। তোমরা তাদের জন্য এত কিছু করেছ তবুও তারা সন্তুষ্ট নয়। সে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে বলে, মুহাজিরদের প্রতি তোমরা এত অনুগ্রহ করেছ, এমনকি তোমরা নিজেদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছ– তবুও তারা সন্তুষ্ট নয়। তোমরা তাঁর অর্থাৎ, মুহাম্মদ (সা.)-এর খাতিরে নিহত হয়েছ আর তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে এতিম বানিয়েছ। এর ফলে তোমাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে আর তারা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হযরত যায়েদ বিন আরকাম (রা.) আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাই এর একথা শোনেন যে, **'আমরা মদীনায় পৌঁছার পর সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে সেখান থেকে বহিস্কার করবে'** তখন তিনি (রা.) সেখানেই দাঁড়িয়ে তাকে বলেন, **আল্লাহ্‌র কসম! তুই-ই জাতির সবচেয়ে লাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি আর মুহাম্মদ (সা.) রহমান খোদার পক্ষ থেকে বিজয়ী ও মর্যাদার অধিকারী এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে শক্তিধর। তিনি (রা.) আত্মাভিমান প্রদর্শন করেন।** তখন ইবনে উবাই তাঁকে বলে, তুই চুপ কর, আমি তো কেবল হাসি-ঠাট্টা ও ক্রীড়াকৌতুক করছিলাম। (সে ভয় পেয়ে যায়।) যায়েদ বিন আরকাম (রা.) এসব কথা শুনে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তখন তাঁর পাশে আনসার ও মুহাজির সাহাবীদের একটি দলও উপস্থিত ছিলেন। যায়েদ (রা.) তাঁকে ইবনে উবাইয়ের সব কথা খুলে বলেন।

বুখারীর এক রেওয়ায়েতে আছে, যায়েদ বিন আরকাম (রা.) তার চাচার কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করেন আর চাচা মহানবী (সা.)-কে একথা বলেন। তখন মহানবী (সা.) তৎক্ষণাৎ যায়েদকে ডেকে পাঠান। মহানবী (সা.) যায়েদের কথা অপছন্দ করেন এবং তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, হে বালক! ইবনে উবাইয়ের ওপর সম্ভবত তোমার কোনো রাগ আছে। যায়েদ (রা.) বলেন, না। আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি তাকে একথা বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেন, সম্ভবত তুমি শুনতে ভুল করেছ। যায়েদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.), আমি ভুল শুনি নি। তিনি (সা.) বলেন, সম্ভবত তুমি তালগোল পাকিয়ে ফেলেছ। যায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্‌র কসম! এমন নয়।

সেনাদলের মাঝে ইবনে উবাইয়ের কথা ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষ এ কথা নিয়েই তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়। আর আনসার সাহাবীরা যায়েদ (রা.)–কে ভর্ৎসনা এবং সাবধান করতে থাকেন আর বলেন, তুমি তোমার জাতির নেতার বিরুদ্ধে এই অপবাদ আরোপ করেছ? তুমি তার বিরুদ্ধে এমন কথা বলেছ যা সে বলে নি। যায়েদের চাচাও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, তোমার কি হয়েছে, মহানবী (সা.) তোমাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন আর তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যায়েদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সে যা বলেছে তা আমি স্বয়ং শুনেছি। **আল্লাহ্‌র কসম! খাযরাজ গোত্রে আব্দুল্লাহ্‌ বিন উবাইয়ের চেয়ে আর কেউ আমার এত**

বেশি প্রিয় ছিল না। আমি যদি আমার পিতার কাছ থেকেও এমন কথা শুনতাম তাহলে আমি অবশ্যই তা মহানবী (সা.)-কে বলতাম। (এমন কথা যা আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলেছিল, আমার তো কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। তাঁর ঈমান খুবই দৃঢ় ছিল।) তিনি (রা.) বলেন, আমার পিতাও যদি এ কথা বলতো তবে আমি তা অবশ্যই মহানবী (সা.)-কে বলতাম আর আমি আশা রাখি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করবেন যা আমার কথার সত্যায়ন করবে। যায়েদ (রা.) এই অবস্থায় খুবই মর্মাহত হন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি এতটাই মর্মাহত হই যে, ইতঃপূর্বে আমি কখনো এত দুঃখ পাই নি। আমি আমার বাড়িতে বসে থাকি। (এখানে বাড়ি বলতে তার আবাসনের স্থান বুঝাচ্ছে, যেখানে তিনি তাঁবু খাঁটিয়েছিলেন। এটি মদীনার বাড়ির কথা নয়, কেননা এই পুরো ঘটনাই মদীনার বাইরে ঘটেছে।)

যায়েদ (রা.) লোকদের কথা থেকে বাঁচার জন্য তাদের সামনে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তার ভয় ছিল পাছে লোকেরা তাকে দেখে বলবে যে, তুমি মিথ্যা বলেছ।

অন্যদিকে বৈঠকে উপবিষ্ট আনসার যখন মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য এবং যায়েদকে প্রদত্ত উত্তর শোনে তখন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন লোক সেখান থেকে উঠে এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের কাছে গিয়ে তাকে সংবাদ দেয় আর অওস বিন খওলী বলে, হে আবু হুবাব (এটি তার ডাকনাম)! তুমি যদি এমন কথা বলে থাকো তাহলে মহানবী (সা.)-কে বলে দাও যেন তিনি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর তুমি এটি অস্বীকার কোরো না। পাছে তোমার বিষয়ে কোনো ওহী অবতীর্ণ হয়ে তোমাকে আবার মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না করে। আর তুমি যদি এমন কথা না বলে থাকো তাহলে মহানবী (সা.)-এর কাছে এর কারণ বর্ণনা করো আর কসম খেয়ে বলো যে, তুমি এমন কথা বলো নি। তখন সে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, সে এমন কোনো কথা বলে নি। এরপর ইবনে উবাই মহানবী (সা.)-এর কাছে যায়। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে ইবনে উবাই! তুমি যদি এমন কথা বলে থাকো তাহলে তুমি তওবা করো। তখন সে কসম খেতে থাকে যে, যায়েদ যা-ই বলেছে, আমি তা বলি নি।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই যখন জানতে পারে তখন সে স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর সমীপে যায় এবং সে আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলে, যায়েদ আপনাকে যে কথা বলেছে, আমি তা বলি নি। অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই এবং তার সঙ্গীদের ডেকে পাঠান। তখন সে কসম খেয়ে বলে, সে এমন কোনো কথা বলে নি। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে আনসার সাহাবীরা বলেন, সম্ভবত এই বালক কথা বুঝতে ভুল করেছে অথবা ইবনে উবাই যে কথা বলেছে সে কথা তার সঠিকভাবে স্মরণ নেই। এ কথা তারা ইবনে উবাইকে রক্ষা করার জন্য বলেন, কেননা সে তার জাতির মাঝে সম্মানিত ও মর্যাদাবান লোক ছিল। কেউ কেউ মনে করে যে, যায়েদ (রা.) সত্য কথা বলছে আবার কিছু লোক তার বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, যায়েদ (রা.) বয়সে ছোট হলেও সত্য কথাই বলছে। যাহোক, অধিকাংশ জ্যেষ্ঠরা তাকে ভুল বুঝেছিলেন।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন ইবনে উবাইয়ের ঘটনা ঘটে তখন আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। মহানবী (সা.) গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস তাঁর শরীর টিপে দিচ্ছিল। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র

রসূল (সা.)! সম্ভবত আপনার কোমরে ব্যথা? তিনি (সা.) বলেন, গত রাতে আমাকে উটনী ফেলে দিয়েছিল।

তিনি (রা.) বলেন, এসবের পর আমি মূল কথায় আসি। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের মস্তক ছিন্ন করার এবং হত্যা করার অনুমতি দিন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি যদি সাহাবীদেরকে বলি তাকে হত্যা করতে তবে তারা তাকে হত্যা করবে তখন মদীনার বহু লোকের কাছে এটা অপছন্দনীয় মনে হবে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মুহাম্মদ বিন মাসলামাকে আদেশ দিন, তিনি যেন তাকে হত্যা করেন। মহানবী (সা.) বলেন, লোকেরা কি (তখন) একথা বলে বেড়াবে না যে, আমি আমার সঙ্গীদের হত্যা করছি। আমি নিবেদন করি, তাহলে আপনি লোকদেরকে যাত্রা করার নির্দেশ দিন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে।

এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, তিনি (সা.) স্বয়ং হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, সবাইকে যাত্রা করার ঘোষণা দাও। এটি দিনের এমন একটি সময় ছিল, সাধারণত এমন সময়ে মহানবী (সা.) যাত্রা করতেন না। মহানবী (সা.)-এরও ধারণা ছিল যে, সে অবশ্যই একথা বলেছে, আর সেই কথা পূর্ণ করার জন্যই তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে সে তো বলে (সম্মানিত ব্যক্তি) লাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বের করে দিবে, তাহলে চলো যাত্রা শুরু করি। মদীনায় ফেরত যাই, দেখি সে কী করে। যাহোক, হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি লোকদের মাঝে যাত্রা করার ঘোষণা দেই। তখন ভীষণ গরম ছিল আর মহানবী (সা.)-এর অভ্যাস ছিল, তিনি (সা.) ঠাণ্ডার সময় সফর করতেন। কিন্তু ইবনে উবাইয়ের সংবাদ আসার পর তখনই (তিনি) যাত্রা করেন আর সর্বপ্রথম সা'দ বিন উবাদার (সা.)-র তাঁর সাক্ষাৎ হয়, আবার কেউ কেউ বলেন, উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-র সাথে দেখা হয়। তিনি (রা.) বলেন, **"আসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নবিয়্যু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।** উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, **ওয়া আলাইকাস সালামু ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু**। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এমন এক গরমের সময় যাত্রা করছেন, যে সময় যাত্রা করা আপনার অভ্যাস বহির্ভূত? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি কি সে কথা শোনো নি, যে কথা তোমার সাথী বলেছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! কোন্ সাথী? তিনি (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বলেছে, যখন সে মদীনায় যাবে তখন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করে দিবে? তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি চাইলে তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন, কেননা সে নিকৃষ্টতম এবং আপনি সম্মানিত আর সকল সম্মান আল্লাহ্‌র জন্য এবং আপনার জন্য আর মু'মিনদের জন্য। এরপর নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্ আপনাকে (এমন সময়) মদীনায় এনেছেন যখন তার জাতি তার জন্য রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে মদীনায় নিয়ে এসেছে অথচ সে ভাবছে, আপনি তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন। **(সহীহ্ বুখারী, কিতাবঃ তফসীরুল্ কুরআন, হাদীস নংঃ ৪৯০৪, ৪৯০৫), (হুদাস্ সারী মকদ্দমা ফাতহুল্ বারী, পৃঃ ৪৬৮, করাচির কাদীমী কিতাবখানা থেকে প্রকাশিত), (সুবুলুল হুদা ওয়ার্ রাশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮-৩৫০, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত), (আস্ সীরতুন্ নবুবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ৪৭০-৪৭১, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবিল্ ইলমিয়্যা থেকে প্রকাশিত)**

যাহোক, মহানবী (সা.) যায়েদের কথা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তিনি সত্য বলেছেন আর আব্দুল্লাহ্ মিথ্যা বলছে। কিন্তু সে সময় তিনি (সা.) যৌক্তিক কারণে নীরব ছিলেন আর তিনি বলেন, চলো মদীনায় গিয়ে দেখি কে অধম আর কে উত্তম। যাহোক, অবশেষে এটিই

প্রমাণ হয় যে, তার দোষ ছিল আর সে এমন কথা বলেছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এর বিশদ বিবরণে যা লিখেছেন, তা-ও ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

আগামী শুক্রবার থেকে ইনশাআল্লাহ্ যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসাও আরম্ভ হবে। তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্ (এ জলসাকে) সবদিক দিয়ে কল্যাণমণ্ডিত করুন আর সকল কর্মীকে উত্তম আদর্শ প্রদর্শন করার এবং ত্যাগের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের তৌফিক দিন। যেসব অতিথি এসেছেন তাদেরকেও এখানে স্বীয় সুরক্ষা বেষ্টনিতে আবদ্ধ রাখুন। যারা সফরে আছেন, (জলসায়) আসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যাত্রা আরম্ভ করতে যাচ্ছেন অথবা যারাই আসবেন, সবার প্রতি আল্লাহ্ কৃপা করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে নিয়ে আসুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব। তাদের মধ্যে প্রথম জানাযা হচ্ছে, **সেলিমা বানু সাহেবার**, যিনি উত্তরভারতের নাযের দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, হামীদ কওসার সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। মুহাম্মদ হামীদ কওসার সাহেব লিখেন, তিনি জম্মু কাশ্মিরের ভদরাওয়াঁ নিবাসী মরহুম আব্দুল গনী সাহেবের কন্যা ছিলেন। যিনি মৌলভী মোহাম্মদ হোসেইন সাহেবের মাধ্যমে ১৯৩৫ সালে বয়আত করেছিলেন। (তিনি) পাহাড়ী এবং বরফময় পথ পায়ে হেঁটে আর কিছু পথ এক্কা গাড়িতে চড়ে দেশ বিভক্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কাদিয়ানের বার্ষিক জলসায় আসতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বক্তব্য শোনার গভীর আগ্রহ ছিল। নিজের স্ত্রী সম্পর্কে বলেন, ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী হিসেবে আমরা যৎসামান্য যে ভাতা পেতাম তা দিয়ে অত্যন্ত মিতব্যায়ীতার সাথে চলতেন আর অতিথিসেবাও করতেন আর বলতেন, **আল্লাহ্ তা'লা এই (যৎসামান্য) ভাতায় অসাধারণ বরকত দিয়েছেন। স্বল্পেতুষ্ট ছিলেন, কখনো কোনো অভিযোগ করেন নি। এটি তাদের জন্যও শিক্ষণীয় যারা অনেক সময় অভিযোগ করে বসেন।** এরপর কওসার সাহেব বলেন, আমার প্রথম পদায়ন হয়েছিল শ্রীনগরে। সেখান থেকে আমার বোম্বেতে বদলি হয়। বোম্বেতে (তিনি) সদর লাজনা হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন। এরপর (আমার) কাবাবীরে বদলি হয়। সেখানে তিনি বলেন, আমার জন্য আরবী শেখা কঠিন, তাই মহিলাদের কাছ থেকে আমি সাধারণ আরবী কথাবার্তা শিখে নিচ্ছি। এরপর তিনি শিখেন এবং খুব দ্রুত আত্মস্থ করেন আর তাদের (লাজনাদের) তা'লীম-তরবীয়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৮৬ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত এগারো বছর সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্, কাবাবীর হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন। লাজনা ইমাইল্লাহ্‌কে নতুনভাবে সুসংগঠিত করেন। ইজতেমা আয়োজনের সূচনা করান। (একবার) ইজতেমা হচ্ছিল, তখন এই প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)ও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন যে, কাবাবীর জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা হচ্ছে আর বলেন, (এটি) তাদের পঞ্চম ইজতেমা। এরপর বলেন, লাজনা ইমাইল্লাহ্, কাবাবীর সমগ্র আরব নারীদের সমন্বয়ে গঠিত লাজনা। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন হিন্দুস্তান থেকে যাওয়া কাশ্মিরী মহিলাও আছেন কিন্তু তিনিও এখন পুরোপুরি আরবদের ন্যায় হয়ে গেছেন। তাদের সাথে মিলেমিশে তিনি তাদের তরবীয়ত করেছেন। এরপর (কওসার সাহেব) বলেন, ১৯৯৮ সালে আমি ফেরত চলে আসলে তিনিও আমার সাথে ভারতে চলে আসেন আর যতদিন স্বাস্থ্য ও পরিবেশ অনুকুল ছিল, মরহুমা প্রায় প্রতিদিন

বায়তুদ্ দোয়া এবং মসজিদে মুবারক, বায়তুয্ যিকর এবং বেহেশতি মকবেরায় নফল ও দোয়ার উদ্দেশ্যে যেতেন।

কাবাবীর জামা'তের আমীর শরীফ ওদে সাহেব লিখেন, মরহুমাকে প্রথম সদর লাজনা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। লাগাতার ছয় বছর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। কওসার সাহেব বেশি (সময়ের কথা) লিখেছেন। তিনি ছয় বছরের কথা লিখেছেন। যাহোক, যতদিন সেখানে ছিলেন শেষ সময় পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন। মরহুমা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে লাজনাদের তা'লীম ও তরবীয়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মরহুমা তার সদ্ব্যবহার ও উত্তম আদর্শ দ্বারা কাবাবীর জামা'তের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সফল হন। দ্রুতই আরবীতে কথাবার্তা বলতে শিখেছিলেন এবং জামা'তের ছেলে-মেয়েদের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। তিনি বলেন, (কাবাবীর) থেকে কাদিয়ানে ফেরত গিয়েও আমৃত্যু প্রায় ২০ বছর কাবাবীরের লাজনাদের সাথে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। আর যখন সেখানে (কাবাবীরে) ছিলেন তখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের যত্ন-আত্তি করতেন, (তার) অতিথিসেবার বিশেষ গুণ ছিল। একইভাবে জামা'তের কেন্দ্রের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতিও গভীর মনোযোগ দিতেন।

(মরহুমার) শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক মেয়ে এবং দুই ছেলে আছে। তার এক পুত্র আতাউল মজীদ মুবাশ্বের কওসার, যিনি যুক্তরাজ্যে এমটিএ আল্ আরাবিয়া বিভাগে সেবাদান করছেন, দায়িত্ব পালন করছেন। তার মেয়ে বুশরা কওসার হল্যাণ্ড নিবাসী, ডা. আয়মান ওদে'র সহধর্মিনী। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্, হল্যাণ্ডের ন্যাশনাল সেক্রেটারী খেদমতে খালক হিসেবে সেবাদান করছেন। ছোট ছেলে শরীফ কওসার, কাদিয়ানে নায়েব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মুরব্বী। এছাড়া তিনি অডিও-ভিডিও বিভাগের এডিশনাল ইনচার্জও বটে। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন আর তার পুণ্যসমুহ তার সন্তানদের মাঝেও বহাল রাখুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ **নূরুল হক মাযহার সাহেবের**। তিনি ছিলেন লাহোর নিবাসী এবং তানজানিয়া জামাতের মুরব্বী রাগেব যিয়াউল হক সাহেবের পিতা। সম্প্রতি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন।

রাগেব যিয়াউল হক সাহেব লিখেন, তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার দাদা মুন্সী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে, যিনি ১৯০৫ সালে তার চাচার সাথে বয়আত করার আগ্রহ নিয়ে কাদিয়ান গমন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পেছনে নামায পড়ারও সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আতের আবেদন করেন কিন্তু ঘোষণা দেওয়া হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কিছুটা অসুস্থ তাই (এখন) বয়আত নেওয়া হবে না। (তাই) সেদিন বয়আত হয়নি, তিনি ফেরত চলে যান। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-র হাতে বয়আত করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ভাড়া বাসায় থাকতেন, বিরোধীরা সেই বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাড়ির সব মালপত্র পুড়ে যায়। কেউ আশ্রয় দিচ্ছিল না। এরপর একজন আহমদী নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন। তিনি বলেন, আমার পিতা পরম ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে সেই ছোট্ট ঘরে দিনাতিপাত করেন। কখনো তিনি কোনো অভিযোগ করেন নি আর এ কথা বলেন নি যে, সবকিছু পুড়ে গেছে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'লা কিছুকাল পর তাকে নিজের বাড়ি বানানোর তৌফিক দেন আর তিনি একথাই বলতেন যে, এটি ১৯৭৪ সালের কুরবানীর প্রতিদান যা আল্লাহ্ (আমাকে) দিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে মুগল পুরা মসজিদের

নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করছিলেন, তখন অ-আহমদীরা মসজিদে আক্রমণ করে। তারা লোহার শিক দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে ফলে তিনি আহত হন এবং আজীবন তার মাথায় এই (আঘাতের) চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে সর্বদা তাহাজ্জুদে আকুতি-মিনতি করতে দেখেছি, এছাড়া নিয়মিত নামায পড়তেন, বাড়িতে নামায সেন্টার ছিল। পাঁচবেলা নামাযের ইমামতি করতেন। পবিত্র কুরআন পাঠ এবং পরিবারের সদস্যদেরকে নামাযের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি বলেন, একদা পাড়ার মসজিদের মৌলভী বক্তৃতা করে বলে, আহমদীদের কুরআন আলাদা, (তারা) ভিন্নভাবে নামায পড়ে। তিনি বলেন, সেই সময় মসজিদেই আমাদের এক অ-আহমদী প্রতিবেশী ছিলেন, তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, মৌলভী সাহেব! আপনি ভুল বলছেন। কেননা, পুরো গলিতে শুধুমাত্র একটি বাড়ি আছে যেখান থেকে কুরআন পড়ার শব্দ ভেসে আসে আর সেটা নূরুল হকের বাড়ি। আর তিনি সেই কুরআনই পাঠ করেন যা আমরা পড়ি। বর্তমান সময়ে তো মৌলভীদের ভয়ে কেউ একথা বলতেই (সাহস) করে না। যাহোক, তিনি নিজের পাড়ায় নিতান্তই ভদ্র ও পুণ্যবান মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। এমনকি তাঁর সর্বশেষ অসুস্থতার সময়ও অ-আহমদীরা, এমনকি ঘোর বিরোধীরাও খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য তার বাড়িতে আসত। তিনি অত্যন্ত উদার ও দরিদ্রদের সেবক ছিলেন। কাউকে কিছু না বলেই অভাবীদের কাছে খোরাক পাঠিয়ে দিতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে গেছেন। এক মেয়ে আমাতুল মতীন, যিনি জামাতের মুরব্বী আলীম মাহমুদ সাহেবের সহধর্মিনী। তিনিও ঘানায় অবস্থানের কারণে জানাযায় শরীক হতে পারেন নি। মৃত্যুর সময় সেখানে ছিলেন না। ছেলে রাগেব যিয়াউল হক, তানজানিয়ায় মুরব্বী হিসেবে সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন, তিনিও কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে তার পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন। আর তাদের সবাইকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ **আমাতুল হাফিজ নিঘাত সাহেবার** যিনি রাবওয়া নিবাসী মরহুম মুহাম্মদ শফী সাহেবের সহধর্মিনী ছিলেন। তিনিও সম্প্রতি ইন্তেকাল করেছেন। মরহুমা মূসীয়া ছিলেন। আর জার্মানীর মুরব্বী মুবারক তানভীর সাহেবের শাশুড়ি ছিলেন। তার মেয়ে আমাতুল জামীল গাযালা, যিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ জার্মানীর নায়েব সদর।

আমাতুল জামীল সাহেবা লিখেছেন, আমার মা নামায ও রোযায় একনিষ্ঠ ছিলেন। উন্নত গুণাবলীর অধিকারিনী এক পুণ্যবতী নারী ছিলেন। কেউ দোয়ার জন্য বললে, তার জন্য দোয়া করা অপরিহার্য জ্ঞান করতেন আর গভীর ব্যাকুলতার সাথে ও বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে তার জন্য দোয়া করতে থাকতেন। খিলাফতের প্রতি পরম বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর সন্তানদেরও এই শিক্ষাই দিতেন। জামাতের কাজে অগ্রগামী ছিলেন আর আমাদের ব্যবহারিক আদর্শ দ্বারা শিখিয়েছেন যে, ধর্মের সেবাই প্রকৃত মূলধন। লাজনার বিভিন্ন পদে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। তবলীগের জন্য সীমাহীন উন্মাদনা রাখতেন। তবলীগের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটেই দূর-দূরান্তের এলাকায় চলে যেতেন। যতদিন সেখানে (পাকিস্তানে) তবলীগ করার অনুমতি ছিল, এত বেশি বিরোধিতা ছিল না। খুব বেশি মামলা-মকদ্দমা হতো না তখন তবলীগ করতে থাকেন। চিকিৎসা শিবির স্থাপন করে হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করতেন। তার প্রচেষ্টায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে প্রায় পঞ্চাশটি ফলও দান করেন অর্থাৎ, তিনি লোকদের বয়আত করানোরও তৌফিক লাভ করেন। পার্থিব বিচারে পড়াশোনা কম হলেও জ্ঞানার্জনের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল। ধর্মীয় বই-পুস্তক পড়েই অত্যন্ত দলীলভিত্তিক আলাপ-আলোচনা

করতেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির মেধার মান অনুসারে তার সাথে কথা বলতেন। কখনো কোনো ভিখারী (তার দরজা থেকে) রিক্তহস্তে ফিরে যায়নি। নারীদের সর্বদা একথা বলতেন, চাওয়ার পরিবর্তে উপার্জনের চেষ্টা করো। অনেক দরিদ্র মেয়েকে নিজের বাড়িতে রেখে তাদের শিক্ষা-দীক্ষারও ব্যবস্থা করেছেন আর তারপর সানন্দে তাদের বিয়ের খরচ বহন করেছেন, আর সর্বদা তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করেছেন। গাযালা সাহেবা বলেন, আমি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই তখন তিনি বলেন, তুমি ওয়াক্‌ফে যিন্দেগী তাই আমি তোমাকে আটকাবো না, তুমি তোমার ছুটি কটিয়ে ফিরে যাও। গুরুতর অসুস্থতার সময় ভাইও বলেছিল যে, তাকে আসতে বলি, তিনি উত্তরে বলেছিলেন না; সে ওয়াক্‌ফ, তাকে ডেক না। শোকসন্তপ্ত পরিবারে দুই ছেলে ও দুই কন্যা এবং অনেক নাতি-নাতনি রেখে গেছেন, যারা সবাই কোনো না কোনোভাবে জামাতের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন। তিনি তার বাড়িতে অত্যন্ত পুণ্যময় একটি পরিবেশ তৈরি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার দুই জামাতাও জামাতের সেবা করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা (মরহুমার প্রতি) দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তার বংশধরদের মাঝে তার পুণ্যসমূহ বহাল রাখুন, (আমীন)।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডন কর্তৃক অনূদিত)